

কলাম

মতামত

প্রশ্নপত্রের ভুল কি কেবল পূর্ণ নম্বরেই শেষ



মো. সাহাবুল হক

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক

প্রকাশ: ১৮ জুলাই ২০২৬, ১৪: ১৬



এইচএসসি পরীক্ষার্থী ফাইল ছবি

উচ্চমাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষা বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষা। প্রতিবছর লাখো শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা, পেশাগত ভবিষ্যৎ এবং জীবনের পরবর্তী ধাপ অনেকাংশেই এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপর নির্ভর করে। তাই এই পরীক্ষাকে ঘিরে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও রাষ্ট্র—সবার প্রত্যাশা থাকে সর্বোচ্চ মানের প্রস্তুতি, নির্ভুল প্রশ্নপত্র

ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা। কিন্তু চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষাকে ঘিরে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা আবারও দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা সামনে এনে দিয়েছে।

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের সৃজনশীল অংশের ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নে ভুল ধরা পড়ার পর দেশজুড়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার্থীরা শুধু প্রশ্নের ভুলই নয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া এবং পরীক্ষার সূচি নিয়ে সমন্বয়হীনতারও অভিযোগ এনেছেন।

আন্দোলনের মুখে সরকার স্বীকার করেছে যে প্রশ্নপত্রে ভুল ছিল। সংসদে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ঘোষণা দিয়েছেন, ওই দুটি প্রশ্নের জন্য সব পরীক্ষার্থী পূর্ণ নম্বর পাবেন এবং প্রশ্নপত্র মডারেশনের সঙ্গে যুক্ত চার শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

কিন্তু এখানেই কি সমস্যার সমাধান? পূর্ণ নম্বর দিয়ে কি পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, উদ্বেগ ও বিভ্রান্তির ক্ষতিপূরণ সম্ভব? আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো, এই ভুল ঘটল কীভাবে?

বাংলাদেশে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠোর ও বহুস্তরবিশিষ্ট। প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ সাধারণত পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক বছরেরও বেশি আগে শুরু হয়। প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের একটি তালিকা থাকে। সেখান থেকে চারজন শিক্ষককে আলাদাভাবে চারটি প্রশ্নপত্র তৈরি করতে দেওয়া হয়।

পরে আরও চারজন শিক্ষক সেই প্রশ্নগুলো মডারেশন বা পরিমার্জনের কাজ করেন। এরপর প্রতিটি বোর্ড চারটি করে চূড়ান্ত সেট তৈরি করে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির কাছে পাঠায়। সেখানে লটারির মাধ্যমে সেট নির্বাচন করা হয়, তারপর বিজি প্রেসে ছাপানো হয় এবং কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছায়।

পুরো প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তা এতটাই কঠোর যে প্রশ্নপ্রণেতা ও মডারেটরদের বাইরের যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। অর্থাৎ প্রশ্নপত্র একটি নয়, বহু ধাপ অতিক্রম করে পরীক্ষার্থীর হাতে পৌঁছায়। তাহলে এতগুলো স্তর পেরিয়েও কীভাবে একটি মৌলিক ভুল রয়ে যায়?

এই প্রশ্নের উত্তর শুধু ‘মানবিক ভুল’ বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কারণ, এটি কোনো একক ব্যক্তির ব্যর্থতা নয়; এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত। যদি একজন প্রশ্নপ্রণেতা ভুল করেন, মডারেটর তা ধরবেন। মডারেটর না ধরলে বোর্ডের পর্যালোচনায় ধরা পড়ার কথা। সেটিও না হলে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে ধরা পড়ার কথা। এতগুলো নিরাপত্তা স্তর অতিক্রম করে ভুল প্রশ্ন পরীক্ষার হলে পৌঁছানো মানে কোথাও না কোথাও জবাবদিহির ঘাটতি রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, প্রশ্নপত্র তৈরির কাজ বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল। প্রশাসনিক বাস্তবতায় বক্তব্যটির একটি প্রেক্ষাপট থাকতে পারে। কারণ, প্রশ্নপত্র প্রস্তুতির কাজ দীর্ঘমেয়াদি। কিন্তু রাষ্ট্র

পরিচালনায় দায়বদ্ধতার নীতি ভিন্ন কথা বলে। যে সরকার দায়িত্বে থাকে, পরীক্ষা পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্ব তারই। অতীতের ওপর দোষ চাপিয়ে বর্তমানের ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু সমাধান করা যায় না।

আরও উদ্বেগের বিষয় হলো, এটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত কয়েক বছরে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রে ভুল, মুদ্রণ ত্রুটি, সিলেবাস নিয়ে বিতর্ক এবং প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ বহুবার উঠেছে। প্রতিবারই তদন্ত কমিটি হয়েছে, কারণ দর্শানোর নোটিশ হয়েছে, সাময়িক বরখাস্ত হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২০১৫ সালের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র চার বছরে(২০১১-২০১৪) পাবলিক পরীক্ষার ৬৩টি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। কিন্তু কয়েক মাস পর আবারও নতুন বিতর্ক। ফলে সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা কি কেবল আলামতের চিকিৎসা করছি, নাকি মূল রোগটি অক্ষত রেখে দিচ্ছি?

প্রশ্নপত্রে ভুলের সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। পরীক্ষার হলে একজন শিক্ষার্থী জানেন না, প্রশ্নটি ভুল নাকি তিনি উত্তর জানেন না। ফলে অযথা সময় নষ্ট হয়, আত্মবিশ্বাস কমে যায়, উদ্বেগ বাড়ে। পরে যদি ঘোষণা আসে যে ওই প্রশ্নে পূর্ণ নম্বর দেওয়া হবে, তবু পরীক্ষা কক্ষের সেই মানসিক চাপ আর ফিরে আসে না। পাবলিক পরীক্ষা এমনিতেই একটি উচ্চ চাপের পরিবেশ। সেখানে প্রশাসনিক ভুলের বোঝা শিক্ষার্থীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন সময় এসেছে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থাকে আধুনিক করার। প্রথমত, প্রশ্ন চূড়ান্ত হওয়ার আগে বিষয়ভিত্তিক স্বাধীন বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক মান যাচাই করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নপ্রণেতা ও মডারেটর নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। অনেকে অভিযোগ করেন বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ অনেক সময় তাদের পছন্দমতো প্রশ্নপ্রণেতা এবং মডারেটর নিয়োগ করে থাকেন। সে ক্ষেত্রে তারা অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতার চেয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগকে গুরুত্ব দেন। এ বিষয়টাও গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয়ত, প্রতিটি ভুলের তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করে জনগণকে জানাতে হবে, কোথায় ব্যর্থতা ছিল এবং কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। চতুর্থত, প্রশ্নপত্রে গুরুতর ভুলের জন্য প্রশাসনিক শাস্তির পাশাপাশি পেশাগত জবাবদিহির স্থায়ী কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

এ ছাড়া প্রযুক্তির ব্যবহারও বাড়াতে হবে। গাণিতিক সমীকরণ, চিত্র, সূত্র এবং তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন যাচাইয়ের জন্য ডিজিটাল ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। উন্নত অনেক দেশে প্রশ্নপত্র প্রকাশের আগে একাধিক পর্যায়ে সফটওয়্যার ও বিশেষজ্ঞ—উভয় পর্যায়েই যাচাই করা হয়। বাংলাদেশেও সে ধরনের মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গড়ে তোলার সময় এসেছে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার একটি ভিন্নধর্মী প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন সেমিস্টার অথবা চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র নিরীক্ষণের জন্য বিভাগ থেকে পাঁচ-ছয় সদস্যের একটি কমিটি থাকে। সেখানে বহিরাগত পরিদর্শকও থাকেন। তাঁরা প্রশ্নকর্তাদের (আন্তঃপরীক্ষক এবং বহিঃপরীক্ষক) কাছ থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করেন এবং প্রশ্নপত্র নিরীক্ষণ করেন।

প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পর টাইপ করার সময় অনেক ছোটখাটো ভুল ধরা পড়ে, সেটি কমিটির সদস্যরা তৎক্ষণাৎ বসে ঠিক করে দেন। শিক্ষা বোর্ডগুলোর এই ধরনের প্রস্তুতিতে ঘাটতি থাকতে পারে, যা তাদের আরও সতর্ক ও পেশাদার হওয়ার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা। একজন শিক্ষার্থী যেন পরীক্ষার হলে বসে প্রশ্নের নির্ভুলতা নিয়ে চিন্তা না করে বরং নিজের জ্ঞান দিয়ে উত্তর লেখায় মনোযোগ দিতে পারেন। সেটিই একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

পদার্থবিজ্ঞানের দুটি প্রশ্নে পূর্ণ নম্বর দেওয়া অবশ্যই তাৎক্ষণিক একটি সমাধান। কিন্তু এটি সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। চারজন শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া বা বরখাস্ত করাও শেষ কথা হতে পারে না। প্রকৃত প্রশ্ন হলো, যে ব্যবস্থায় এত স্তরের নিরাপত্তা থাকার পরও ভুল প্রশ্ন পরীক্ষার হলে পৌঁছে যায়, সেই ব্যবস্থার সংস্কার কবে হবে? কারণ, প্রশ্নপত্রে ভুল মানে শুধু একটি প্রশ্নের ভুল নয়; এটি রাষ্ট্রের শিক্ষা প্রশাসনের প্রতি মানুষের বিশ্বাসে একটি ফাটল। সেই ফাটল যত দ্রুত মেরামত করা যাবে, ততই লাভবান হবেন শিক্ষার্থী, শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্র—সবাই।

- **মো. সাহাবুল হক** অধ্যাপক, পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট